

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে, ১৮৬১ ই আগস্ট ৭ -, ১৯৪১শে বৈশাখ ২৫) (, ১২৬৮ শে শ্রাবণ ২২ -, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ বাংলার দিকপাল কবি (, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি গভীরভাবে সংবেদনশীল", উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থরূপে। রবীন্দ্রনাথ "দ্রুনাথের জন্ম হয়েছিল কলকাতার এক পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি প্রথম কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ সালে মাত্র ষোলো বছর বয়সে ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম ছোটগল্প ও "ভানুসিংহ"

ন এই বছরেই। রবীন্দ্রনাথ ভারতেনাটক রচনা করে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে। বঙ্গীয় শিল্পের আধুনিকীকরণে তিনি ধ্রুপদি ভারতীয় রূপকল্পের দূরুহতা ও কঠোরতাকে বর্জন করেন। নানান রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, সংগীত, নৃত্যনাট্য, পত্রসাহিত্য ও প্রবন্ধসমূহ। তাঁর বহুপরিচিত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল গীতাঞ্জলি, গোরা, ঘরে বাইরে, রক্তকরবী, শেষের কবিতা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ছোটগল্প ও উপন্যাস গীতিধর্মিতা, সহজবোধ্যতা, ধ্যানগম্ভীর প্রকৃতিবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত গান আমার সোনার বাংলা ও জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে- যথাক্রমে বাংলাদেশ ও ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় ঠাকুর প্রথম জীবনে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুসারী কবি। (১৮৯৪-১৮৩৫) তাঁর কবি-কাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় কাব্য তিনটিতে বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট।^[১৩২] সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেন।^[১৩২] এই পর্বের সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাসসংগীত, ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানব হৃদয়ের বিষণ্ণতা, আনন্দ, মর্ত্যপ্ৰীতি ও মানবপ্রেম। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত মানসী এবং তার পর প্রকাশিত সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) (ও ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্ (যান্ত্রিক ভাবনা। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই চিন্তা ধরা পড়েছে নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমালা (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪) (কাব্যগ্রন্থে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটলে বলাকা (১৯১৬) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় (আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিবর্তে আবার মর্ত্যজীবন সম্পর্কে আগ্রহ ফুটে ওঠে।^[১৩২] পলাতকা (১৯১৮) (কবিতা-কাব্যে গল্পের আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে

ধরেন।^[১৩২] পূরবী (১৯২৫ও (মহায়া (১৯২৯কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রেমকে উপজীব্য (করেন।^[১৩২] এরপর পুনশ্চ (১৯৩২(, শেষ সপ্তক (১৯৩৫(, পত্রপুট (১৯৩৬ও (শ্যামলী (১৯৩৬নামে (চারটি গদ্যকাব্য প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ দশকে কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়কার রোগশয্যায (১৯৪০(, আরোগ্য (১৯৪১(, জন্মদিনে (১৯৪১ও (শেষ লেখা (১৯৪১(, মরণোত্তর প্রকাশিতকাব্যে মৃত্যু ও মর্ত্যপ্ৰীতিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট করেছিলেন তিনি (। শেষ কবিতা "তোমার সৃষ্টির পথ" মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্য গল্পগুলির অনেকগুলিই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনের সবুজ পত্র পর্বে ' তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল "কঙ্কাল", "নিশীথে", "মণিহার", "ক্ষুধিত পাষণ", "স্ত্রীর পত্র", "নষ্টনীড়", "কাবুলিওয়ালা", "হৈমন্তী", "দেনাপাওনা", "মুসলমানীর গল্প "ইত্যাদি। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিপিকা, সে ও তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থে নতুন আঙ্গিকে গল্পরচনা করেছিলেন।

‘সুভা’ গল্পের সুভা সম্পর্কে জানি।

‘সুভা’ গল্পের সুভা বাকপ্রতিবন্ধী। সে যে কথা বলতে পারে না, সেটিকে সুভার মা তার নিজের নিয়তির দোষ বলে মনে করে। কথা বলতে না পারলেও সে যে অনুভব করতে পারে, সেটি কারো মনে হতো না। সে জন্য তার সামনেই সবাই তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করত। সে যে বিধাতার অভিষাপ স্বরূপে তার পিতৃগৃহে এসে জন্মগ্রহণ করেছে, সে কথা সে শিশুকাল থেকে বুঝে নিয়েছিল। তার ফল হয়েছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে সে নিজেকে গোপন করে রাখতে সব সময়ই চেষ্টা করত। মনে করত, তাকে সবাই ভুললেই সে বেঁচে যাবে। শুধু প্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্মতা গড়ে উঠেছিল বলে সমবয়সী সাধারণ বালকবালিকারা তাকে একরকম ভয় করত-, তার সঙ্গে দেখা করত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও সঙ্গীহীন ছিল।

সুভার আশ্রয়স্থল কোথায়?

‘সুভা’ গল্পের সুভা কথা বলতে না পারলেও তার বিশাল একটি আশ্রয়ের জগৎ আছে। যারা কথা বলতে পারে না, সেই বোবা-, পোষা প্রাণীদের কাছে সে মুখর। তাদের সে খুবই আপনজন। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দলে ছিল গোয়ালের সর্বশী ও পাঞ্জুলি নামের দুটি গাভি। গাভি দুটি সুভার মুখে তাদের নাম না শুনলেও তার পদশব্দ চিনত। তার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, যার মর্ম তারা ভাষার

থেকেও সহজে বুঝত। সুভার আদর, ভর্সনা, মিনতির ভাষা তারা মানুষের থেকেও ভালো বুঝতে পারত। সুভা গোয়ালে ঢুকে সর্বশীর গ্রীবা জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে নিজের গাল ঘষত, আর পাঞ্জুলি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তা নিরীক্ষণ করে সুভার গা চেটে দিত। দিনে কমপক্ষে তিনবার করে সে গোয়াল ঘরে তার মুক বন্ধু দুটির কাছে যেত, আর বোবা প্রাণী দুটিও তাদের অন্ধ অনুমান শক্তি দিয়ে সুভার মর্মবেদনা যেন বুঝতে পারত। তাই তারা গা ঘেঁষে, বাহতে শিং ঘষে ঘষে তাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সঙ্গে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করত। এ ছাড়া সুভার ছাগল ও বিড়াল ছানাও ছিল, ওগুলোও তার প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করত। সুভা বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে মুক্তির আনন্দ পেত।

সুভা গল্পের প্রতাপ সম্পর্কে বলো।

প্রতাপ অত্যন্ত অকর্মণ্য ছিল। সে কোনো কাজকর্ম করতো না। প্রতাপের বাবা-মা তাকে নিয়ে সকল আশা ত্যাগ করেছেন। অকর্মণ্য হওয়ার সুবিধা হলো কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাদেরকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ— ছিপ ফেলে মাছ ধরা। অপরাহ্নে নদীতীরে প্রতাপকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যেত এবং এই উপলক্ষে সুভার সাথে প্রতাপের প্রায়ই সাক্ষাৎ হতো। যেকোনো কাজেই নিযুক্ত থাক একটা সঙ্গী পেলে ভালো লাগে। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আরেকটু অতিরিক্ত আদর সংযোগে সুভাকে ‘সু’ বলিয়া ডাকিত। সুভা প্রতাপের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতো। কিন্তু সুভার ভালোবাসা প্রতাপ কখনো বুঝতে পারেনি বা হয়তো বুঝতে চায়নি।

সুভার বিবাহ সম্পর্কে জানি:

শুরুদ্বাদশীর রাত্রিতে সুভা শয়নগৃহ হতে বের হয়ে তার সেই চিরপরিচিত নদীতটের কাছে বিদায় নিয়ে বাবা-মার সাথে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করে সাজিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে নিয়ে গেলেন।

বন্ধুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখতে আসলেন— কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বেছে নিতে এসেছেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললেন, “মন্দ নহে।”

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখে সুভাকে পছন্দ হলো। কিন্তু এই ক্রন্দনের পেছনের কারণ কেউ বুঝতে পারলো না বা জানতেও চাইলো না। পঞ্জিকা মিলিয়ে খুব একটা শুল্লগ্নে বিবাহ হয়ে গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হাতে সমর্পণ করে বাপ মা পরম নিশ্চিন্তে দেশে চলে গেল যেন তাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

সুভা গল্পের সারমর্ম: “সুভা” গল্পের কিশোরী সুভা কথা বলতে পারত না। এই গল্পে প্রকৃতি এবং সমাজ পরিবারের মেল বন্ধন ছিল সুভা। প্রকৃতিকে বাদ দিলে জীবনকে খন্ডিত করা হয় এবং বাস্তবচিত্র সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। সুভার করুণ শৈশব ও সংবেদনশীল জীবনবোধের সাথে মিলিয়ে নিসর্গ ধ্বনিত হয়। “সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল এবং ওষ্ঠাধর ভাবের আভাস মাত্র কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।” সুভার সাথে প্রকৃতির অপূর্ব এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সজীবতা দেখানো হয়েছে। যে সজীবতা শৈশবের। সুবিস্তীর্ণ রৌদ্র, ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়া, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো ছোট নদী সব কিছু যেনো একযোগে সুভার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠে যা পাঠক মনে স্নিগ্ধ শৈশব নান্দনিকতায় অনন্য হয়ে ধরা পড়ে। প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে যখন সুভাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার জীবন থেকে ; শৈশব থেকে। প্রকৃতির পরিবেশের সাথে শিকড় জড়িয়ে থাকা সুভার প্রাণের স্পন্দন যখন ছেদ করলো নিষ্প্রাণ শহর, নিষ্ঠুর মানুষ, তখন থেকে বোবা মেয়েটি সত্যিকারের বোবা হয়ে উঠল। সেইসাথে মৃত্যু হলো তার নির্মল শৈশবের।